পরিবিষয়ী

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সবাই ঝাপসা

আই সি সি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে ব'সে টের পেলাম আমার ক্রিকেট-চোখের ওপর চড়া পড়েছে প্রায় দশ বছর। ভারতের অবিকল্প জয় এবং গোটা দেশের আনন্দাতিশয্য দেখতে দেখতে ২৮ বছর আগের সেই সন্ধের কথা যেমন মনে পড়লো বার বার, তেমনি খেলোয়াড়দের সাদা সোয়েটারে নীল বা সোনালী দু-দাগের পাড়, বিজ্ঞাপনহীন সবুজ মখমলের ইডেন, এমনকি শীতের দুপুরে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা হোয়াইট-বর্ডার কি পাড়ার মাঠ দেশপ্রিয় পার্কের সেই ক্রিকেট প্রহরগুলো যে কখন সেকেলে হয়ে গেলো, সময়ের সেই ধূসর স্কোরকার্ড আজ ঝাপসা।

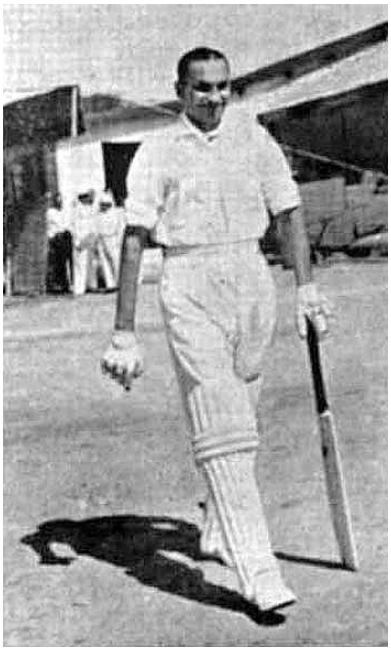

ক্রিকেটারদের জামাকাপড় সার্কাসশিল্পীদের মতো হয়েছে আজ অনেকদিন, আমরা তখনো স্কুলে কি সবে কলেজে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট তখনো ছিলো সর্বৈব, সর্বোচ্চ। সুনীল গাভাস্কারের প্যাডের ওপর থামস-আপ-এর বুড়ো আঙুল সবে উঠতে শুরু করলেও মাঠের ঘাসের ওপর অন্তত বিজ্ঞাপন মারা থাকতো না। ইডেন ঘুমন্ত টেস্ট ম্যাচের বুধবার বেলা দুটোতেও উপচে পড়তো। কপিলের গায়ে কমলালেবু ছুঁড়েও পরের দিন সবুজ গ্যালারি প্ল্যাকার্ড তুলতো, 'উই আর স'রি কপিল, প্লিজ ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট'। সরস মন্তব্যের মাত্রা ও রুচিও ছিলো অসাধারণ! এক ভদ্রলোক বিকেলের দিকে বাথরুমে গিয়ে ফেরার পথে ভুল সীটে চ'লে গেছেন, তখনই পেছন থেকে মন্তব্য এলো - 'কি দাদা! বিকেল চারটে বেজে গেলো এখনো সীট খুঁজে পেলেন না? খেলার স্কোর জানেন তো? বলবো?'

১৯৯০ এর শেষের দিকে শেষবার ইডেনে যাই, তখনো আমি যুবক, কিন্তু টের পেলাম যারা মাঠে ভিড় করছেন, তাদের অনেকের বয়স আমার চেয়ে সামান্য কম বেশি হলেও ক্রিকেটের বিশেষ কিছু বোঝেন না, খেলাটার ইতিহাস তো একেবারেই নয়; তাঁদের সমস্ত রাশিবিজ্ঞান শচিন সৌরভ শেন ওয়ার্নেই আটকে আছে, না জানেন নীল হার্ভের কথা, না শুনেছেন ভিনু মানকড়ের কাহিনী, জ্যাক হব্‌স নামে জনৈক ক্রিকেটার এদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা; শৌর্যের পাশাপাশি খেলাটার অনেকটাই যে একদিন শিল্পের পর্যায়ে ছিলো সেই বোধের জায়গা থেকে আজকের ক্রিকেট, ক্রিকেটার ও দর্শক স'রে এসেছে এটা বুঝতে পেরে তেত্রিশ বছর বয়সেই, আমি সেদিন, 'কেউ কথা রাখেনি' আউড়ে, দর্শক হিসেবে চিরকালের জন্য মাঠ ছাড়ি।

এতগুলো বছর পর সারা দেশের জয়োল্লাসের সাথে বিদেশের একাকিত্বে, নিজেকে মিলিয়ে নিতে প্রচন্ড আনন্দ যেমন হলো, ফিরে আসতে থাকলো আমার কিছু ক্রিকেট-স্মৃতি, যা কবিতার সৌন্দর্যসত্ত্বাকে ধারণ করে নিয়েছে এতদিনে।

তিরিশ বছর আগে ১৯৮০ সালের শীতের একটা দুপুরের কথা মনে পড়ে গেলো। ইডেনে সেদিন এমন কিছু ভিড় ছিলো না। তবু আমার ক্রিকেট-লিখিয়ে অধ্যাপক পিতা তাঁর ১৬ বছরের ছেলেকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন অতীতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন ব'লে। ৭ বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে বিগত ৪০ বছরে কত ম্যাচ দেখেছি ? তার পরিসংখ্যান অসম্ভব। তবু আজ ক্রিকেটের কথা ভাবতে ব'সে সেই দিনটার কথাই মাত্র মনে পড়লো। ভেটারান্সদের খেলা ছিলো, কিন্তু দেশ বিদেশের ভেটারান্স। নিউজিল্যান্ডের বার্ট সাটক্লিফ এসেছিলেন - ওঁর বয়স তখন ৫৬। এসেছিলেন এক সময়ের অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত কেতাদুরস্ত ন্যাটা ব্যাটসম্যান নীল হার্ভে। এসেছিলেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের অফ-স্পিনার লান্স গিবস। তখনো টেস্ট ক্রিকেটের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহী বোলার। এসেছিলেন আরো অনেকে। ষাট দশকে ভারতবর্ষে জন্মে ডন ব্রাডম্যানের খেলা দেখা সম্ভব তো নয়ই, ব্রাডম্যানের সঙ্গে যাঁরা কখনো খেলেছিলেন, তাঁদের খেলাও নয়। কিন্তু আজ মনে প'ড়ে গর্ব হলো - হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম। খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম পঙ্কজ রায়, পলি উম্রিগড় ও বিজয় হাজারেকে সেদিন ব্যাট করতে। হাজারে অর্ধশতক হাঁকিয়েছিলেন, কয়েকটি অসাধারণ কভার ড্রাইভ ছিলো সোনায় বাঁধানো - সে সময়ের 'শচিন' সুনীল গাভাস্কারের পিতৃরূপ দেখা দিচ্ছিলো হাজারের ব্যাটিঙে।

হাজারের দল ব্যাট করতে নামার আগে ইডেনে জালের ধারে নেটে চলছিলো অনুশীলন পর্ব। ভিড় কম, তাই ছুটে চ'লে গেলাম নেটের পেছনে। ইস্পাতের দরজা খোলা ছিলো যেখান দিয়ে মাঠে ঢোকা যায়। কেবল এক ইন্সপেকটর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দূরে দাঁড়াও ভাই, বল লাগলে মারাত্মক লাগবে'। সদর্পে তাকে বলেছিলাম, 'আমরাও ঐ বলে খেলি, লাগবেনা'। ইন্সপেকটর হেসে বললেন, 'স্কুল দলে খেলো নাকি ?'।

আমার তিন ফুট সামনে নেটের ওদিকে এক ভদ্রলোক ব্যাট করছেন। ওঁর পায়ে প্যাড নেই, কেবল হাতে গ্লাভস পরা। গলায় বাঁধা সিল্কের সাদা রুমাল। ঝকঝকে সাদা জুতো। তখনো হেলমেটের যুগ চালু হয়নি, ফলে পক্ককেশের মাথা খালি। বল করছিলেন লান্স গিব্বস। মারাত্মকভাবে ভেঙে যাওয়া প্রাকটিস পিচে গিব্বসের বল ৩ থেকে ৪ ফুট ঘুরছিলো। না, ইঞ্চি নয়, ফুট। এমনিতে লান্স গিব্বস বল ঘোরাতেন অনেকটা। কিন্তু ব্যাটসম্যানের খেলতে অসুবিধে হচ্ছিলো না, তিনি একটা বলও ব্যাকফুটে খেললেন না, একটা বলেও রক্ষণাত্মক নন, ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভও নন ; একবার ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্রিজ ছেড়ে। চকিতে চিতা। মাথা নিচু ক'রে গিব্বসকে সজোরে অফ ড্রাইভ করলেন। ততোদিনে বেশ খানিকটা ভারী হ'য়ে যাওয়া পলি উম্রিগড় আটকাতে পারলেন না বলটা। ছুটে এসে থামাতে পারলেন না মধ্য তিরিশের সুব্রত গুহও। ময়দান প্রান্তের নেট থেকে মারা বল হাইকোর্ট প্রান্তের চকের দাগ পেরিয়ে গেলো। আমরা কিশোররা হাততালি দিলাম। পুলিশদা পানের পিক গিলে আমাদের বললেন - 'ডবল বাউন্ডারি, আট রান হলো। এর নাম মুস্তাক আলি।' হ্যাঁ, হেলমেট, প্যাডবিহীন মুস্তাক আলি। খেলছিলেন ওঁর ছেলের বয়সী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিনার লান্স গিব্বসকে। কত বয়সে ? ৬৬। হাজারের তখন ৬৪। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ভারতীয় স্পিনের বিরুদ্ধে কিম হিউসকে একদিনে একটা ব্রাডম্যানোচিত ইনিংসে ২১৩ করতে দেখেছিলাম। তবু আজ এত বছর পর ঐ ৬৬ বছরের বুড়োর ছুটে বেরিয়ে গিয়ে নিখুঁত অফ-ড্রাইভটাই চোখ আগে চায়।

স্মৃতি এইরকমই। অপ্রত্যাশী, অপ্রত্যাশিত। অবিশ্বাস্য ! আজকাল স্মৃতি, স্বপ্ন আর কল্পনাকে একটা ট্রায়াডের মতো মনে হয়। এক ত্রিযামা। এক ত্রিপ্রদীপ। তার কাঁপা দীপ্তি ঠিক কার কারণে, কথায়, সেটা মেপে বলার অনেক সময়েই কোনো উপায় নেই। জন অ্যাশবেরি একটি কবিতায় একবার লিখেছিলেন -

'বিষাদ জন্মায় সমূহ অতীত থেকে
প'ড়ে থাকা পালক আমাদের পাখির অতীতে ফেরাতে বাধ্য করে
যেন সে পাখির কোনো আজ নেই
এমন এক কোথাও আমরা যার হদিশ পাইনি'

রঙদাগ দেওয়া একপাল ভেড়ার মতোই সমূহের স্মৃতি, সেই পালের একটা আমাদের নিজস্ব স্মৃতি, ব্যক্তিগত। কিন্তু দূর বাড়ে, বাড়ে ময়দানের শীতের কুয়াশা, বাড়ে পাহাড়ের ওপরের অস্পষ্টতা, আর ঠিক সেখানে, সেই আবছায়ার মধ্যেই চ'লে যায় ভেড়ার পাল - কখনো পালকের তাড়নায়, কখনোবা নোনতা পাথর চাটতে। যেটা ছিলো ঐকান্তিক, সমূহের প্রভাবে ওই দূরে গিয়ে কেমন যেন হ'য়ে যায়। ঠিক মেলেনা আর। এক বাঁও, দু বাঁও, সাত বাঁও মেলেনা। আর ঠিক তখনি দ্বন্দ্ব আসে। যেটা ছিলো নিজের স্মৃতি, সত্যিকারের ঘটমান, অনুভূতি, চিন্তা, তার সাথে এখন কল্পনা একাত্ম হ'য়ে যায়। তাহলে কি স্মৃতি এক ধরনের কল্পনা ? বাস্তবেরই এক 'জরা-হাটকে' সত্ত্বা ?

নাকি কল্পনা ব্যাপারটাই স্মৃতির সাহায্যে গ'ড়ে তোলা ? চেতন, অবচেতনের ভাঁড়ারে জমা পড়া উপাদানকে পিষে, তার্পিন মিশিয়ে যে তেলরঙ, সেই দিয়েই কি কল্পনা আঁকা ?

একদিন ঝিলের ধারে এক সিঁদুরে সোহাগী গাছের ডালে মাছরাঙাকে ব'সে থাকতে দেখা যায় ; মাঝে মাঝে সে জলের ওপর দ্রুত নেমে আসছে, ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে জীবন্ত রশদ, ফিরে যাচ্ছে ডালে। আবার অন্য একদিন দেখা গেলো মাছরাঙা ম'রে জলের ওপর ভাসছে, আর একঝাঁক মাছে জলের ওপর ভেসে উঠে তার মৃত শরীর খুবলে খুবলে খেয়ে যায়। কে খাদ্য ? কে খাদক ? এইসব হিসেব যত গোলমাল ক'রে দেওয়া যায় ততো ভালো। স্মৃতির, স্বপ্নের, কল্পনার ও কবিতার।

স্মৃতি ও কল্পনা - এই দুই ঘোলা শরীর একসময়ে মিলেমিশে যায়, দিনের আলোয়, আলোর অভাবে, রাতে অন্ধকারে, ঘুমের মধ্যে। আমরা ত্রিপদীর তিন নম্বরে এসে পৌঁছই -স্বপ্নে। বারবার মনে পড়ে ইঙ্গমার বার্গম্যানের 'পার্সোনা' ছবিটার কথা, যেখানে কথক বিবি অ্যান্ডারসন আর কথাভোলা লিভ উলমানের মুখ গলে মিশে যায় তাম্রলিপ্তের মতো। মনে পড়ে ল্যুই ব্যুনুয়েলের 'Cet obscur objet du désir' ছবির দুই অভিনেত্রীর কথা - ক্যারল বোকে ও অ্যাঞ্জেলা মোলিনা - যাঁরা একই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দৃশ্যে দৃশ্যে বদলে গিয়ে। তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই শরীরের নগ্নতাও এক যমজ সৌন্দর্য তৈরি করেছিলো - যেন একজনের নাম কামনা, আর অন্যজন বাসনা। এইভাবেই স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার ত্রিবেণী সঙ্গম। আধুনিককালে অনেকে বলেন এই সম্পর্ক গতিবিদ্যক, অসরল। মনস্তত্ব আলোচনায় আজকাল এক এক সময় গণিতের ব্যবহার আসে। স্বপ্ন ও কল্পনার যোগাযোগ যে জোরালো, মস্তিষ্কের বা মস্তিষ্কের বাইরে কোথাও তাদের একই ডেরা, একথা কার্ল ইয়ুঙও মনে করতেন। এইভাবেই কুয়াশা আরো ঘন।

কুয়াশা কিন্তু স্থির নয়। আমি তাই ভাবতাম। থিওরি যাই বলুক, আমি তাই ভাবতাম। বছর ১৪ আগেকার এক চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সেই ভুল ভাঙলো। প্রশান্ত মহাসাগরের গায়ে লাগানো প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে। মেহিকো থেকে শুরু হয়ে এঁকে বেঁকে আমেরিকা পেরিয়ে কানাডায় গিয়ে উঠেছে। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সাগর। সেই বড়রাস্তা ধ'রে লস এঞ্জেলিস থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে যাচ্ছিলাম ছোট্ট ড্যানিশ গ্রাম সলভ্যাঙ-এ। যাবার পথে এক জায়গায় মাত্র ৫০ কি যাট ফুটের মত এলাকা জুড়ে দেখলাম নিচের সাগরের উত্তাল ঢেউ থেকে ওঠা জলোচ্ছ্বাসের ফেনায় হাইওয়ের ওপর ঘন কুয়াশা। কিন্তু মাত্র ৫০-৬০ ফুট, তার পর আবার ঝকঝকে রোদ। টেকনিকালি কুয়াশা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু ঐটুকু অঞ্চলে গাড়ি যখন ঢুকলো দেখলাম অন্যদিকে কিছু দেখা যায় না, দেখলাম সেই সাগরসঞ্জাত কুয়াশার ভেতর চতুর্দিকে পাতলা আস্তরের জল ঘুরে চলেছে। উইন্ডস্ক্রীনের ওপর এক পাতলা নদী। সমাপতনে আবার ঠিক সেই সময়েই গাড়ির ক্যাসেট-প্লেয়ারে আরতির গান বাজছে - আয়নাতে মুখ দেখবো না/ না না না। আর আলোকেও কে যেন গলিয়ে ফেলেছে। কুয়াশায় ঢোকার আগেও যা ছিলো ৩০০ ডি পি আই-য়ের শানানো তীক্ষ্ম, কুয়াশার খোলের মধ্যে তার গলনাঙ্ক দ্রুত নেমে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সব আলোয় এসে ঠেকে। আলোর গুণেই হয়তো স্মৃতি, কল্পনা আর স্বপ্নের সহাবস্থান সম্ভব হয়। আলো - সেই হয়তো সময়ের সৎ সংজ্ঞা। ওঁর জীবনীকারদের অনেকে বলেন অল্প বয়সে আইনস্টাইন নাকি স্বপ্ন দেখতেন আলোর বিমে চ'ড়ে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং সময় শীতল, অচল হয়ে প'ড়ে আছে চরাচর জুড়ে। সম্প্রতি রেবেকা শিহান ও ডেভিড রোডোউইক নামে দুজন শিল্প-আলোচকের লেখা পড়ছিলাম। রোডোউইক আপামর শিল্পকে দু ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন - ১) সমলয়ের শিল্প (arts of simultaneity) ও ২) অনুলোমিক বা অনুক্রমিক শিল্প (arts of succession)। সমলয়ের শিল্পের মধ্যে পড়বে চিত্র, ভাস্কর্য, অন্যান্য দৃশ্যজ শিল্প, যার একটি বিশেষ স্থানিক অবস্থান ও আকার আছে, কালিক ততোটা নয়। আর অনুক্রমিক শিল্পের মধ্যে পড়বে সঙ্গীত ও বিশেষ ক'রে কবিতা, যার স্থান-কাল গতিময়ই শুধু নয়, তাদের মধ্যেকার বেড়াটা ঝাপসা। কবিতার ক্ষেত্রে আরো বেশি।

পারীতে আগ্স্ত হ্রদাঁর (August Rodin) সমস্ত ভাস্কর্য রয়েছে ওঁর নামাঙ্কিত যাদুঘর 'মুসে হ্রদাঁয়' (Musée Rodin)। কিছু বছর আগে সেখানে এক শিল্পী এক আলোকচিত্র পরীক্ষাপ্রকল্প চালান। হ্রদাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য 'দ্য কিস' (চুম্বন) - যা ১৯৮২ সালে কলকাতায় আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম - সেই ভাস্কর্যকে নানা কোণ থেকে একটা গোটা দিন ধ'রে বিভিন্ন আলোয় তোলা হয়। সেইসব আলোকচিত্র (যা আসলে একটা স্থির মূর্তিরই ছবি, যেখানে নারী চুম্বনরত পুরুষের কোলে ব'সে রয়েছে) জড়ো ক'রে একটা ফিল্ম বানানো হয়। ফিল্মটা অদ্ভুত। অনড় একসারি ছবি, অচল ভাস্কর্যের। তবু দিনের নানা সময়ে নানা আলোর নানা কোণ থেকে যুগলমূর্তিকে বিচিত্র মনে হয়। মনে হয় নারী সারাদিন ধ'রে কতরকমভাবে তার প্রেমিককে চুমু খেয়েছে, আর প্রেমিকের ধরতাই এক থাকলেও, তার আলতো স্পর্শ প্রেমিকার বাঁ-নিতম্বে ছায়া ফেললেও, তার গোটা শরীর সঞ্চালন, তার চুমু খাওয়ার মনঃসংযোগ যেন সারাদিন ধ'রে বদলেছে।

চলচ্চিত্র এটা পারে। প্লাস্টিক আলোর চলাচলে, উচ্চতা ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে স্থায়ীকেও অস্থির ক'রে তোলে। আলো, যা আসলে বিমূর্ত এক আদল, রীলের ওপর নেমে এসে নিজেকে সাকার ক'রে। এবং সাথে সাথে তার কক্ষের বহতা সময়ের এক স্থায়ী জলছবি সেঁটে দিয়ে যায়। চলচ্চিত্র যেন সমলয়ের শিল্প আর অনুক্রমিক শিল্প - এই দুয়ের মাঝখানটা জুড়ে রয়েছে, কেননা তার স্থানিক ও কালিক অস্তিত্বের দুটোই স্পষ্ট, তেমনি দ্বৈত তার বিভাজনরেখা।

কিন্তু পাথরে লেখা নাম ক্ষয়ে যায়। হৃদয়ে লেখা নামও। মান্না হয়তো মানবেন না, আমরা মানবো। সেইভাবেই জলছবির ঝাপসা হওয়া। চলচ্চিত্রের চলাচল থাকে হয়তো, একইভাবে এক সময় সেও কিন্তু পাংশুটে। যে সময়কে রক্তে বেঁধে ভেবেছিলো চিরস্থায়ী, তার মুখও ক্রমশ ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে।

হারিয়ে যাওয়া নয়, এক হারিয়ে যাবার শিল্পীর কথা বলি। সে কি চলচ্চিত্র পরিচালক না কবি না চিত্রকর ? নাকি একাঙ্গে ত্রিপদী।

'ছবি স্মৃতিকে লুঠ ক'রে, কেননা সে তার জায়গা নিয়ে নেয়'
- যোহান ফ্যান ডার কিউকেন

যোহান ফ্যান ডার কিউকেন (Johan van der Keuken) এক ওলন্দাজ শিল্পী, যিনি ১৯৩৮ সালে আমস্টারডামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্কটরোগে মারা যান ২০০১-এ। মূলত চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেই কিউকেনের পরিচিতি ; অবশ্য চলচ্চিত্রের বেড়া পেরিয়ে প্রায়শই কিউকেন কবিতা, চিত্রকলা ও শব্দশিল্পের এলাকায় ঢুকে পড়তেন। কিউকেনের একটা ছবি প্রতিবাদী কবি ও নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যোদ্ধা লুসেবার্ট (Lucebert, আসল নাম Lubertias Jacobus Swaanswijk)-কে নিয়ে। অত্যন্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, ৩০ দশকের ওলন্দাজ বস্তিতে বড় হয়ে ওঠা লুসেবার্ট ছিলেন স্বপ্নিল, বোহেমিয়ান, প্রতিবাদী, জীবন ও সাহিত্যে নিয়মভাঙা এক কবি। দাদা, অধিবাস্তবতার প্রভাব ছিলো ওঁর ওপর। জর্মন নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে যেমন বন্দুক তুলে নেন, তেমনি ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লিখেছেন সারাজীবন। ইন্দোনেশিয় অভিবাসী জীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রবল কৌতূহল ছিলো। ছবিটা শেষ হয় লুসেবার্টের ছোটোবেলার একটা ফিকে হ'য়ে যাওয়া ছবি দিয়ে। ছবির নিচে লেখা - 'যা কিছু মূল্যবান, আসলে প্রতিরক্ষাহীন'। লুসেবার্টের একটা ছোটো কবিতা এখানে অনুবাদ করলাম -

নোঙর / লুসেবার্ট

যে ভাসে, মানুষের মধ্যে দিয়ে গড়ায়, সেইই পৃথিবী
যার প্রশ্বাস পড়ে, যা উড়ে যায় মানুষের মধ্যে দিয়ে, সেইই বায়ু
মানুষ প'ড়ে থাকে এই ভূমির মতো অসাড়
মানুষ ভেসে থকে বাতাসের মতো উঁচুতে
মায়ের বুক ফুঁড়েই ছেলে ফোটে

বাবার মাথা ফুঁড়ে খেলে কন্যাফুল
নদী আর পাড়ের মতো আর্দ্র ও শুকনো তাদের ত্বক
পথ ও খালের মতোই তারা শূন্যে চেয়ে থাকে
নিজেদের নিঃশ্বাসই তাদের ঘরবাড়ি
নিজেদের মুদ্রাই তাদের বাগান
যেখানে তারা লুকিয়ে রয়েছে কখনো
কখনো উন্মুক্ত

যে ভাসে আর গড়ায়, সেইই পৃথিবী
যা প্রশ্বাসের আর বহতা, তাই বায়ু
যারা মানুষের মধ্যে দিয়ে যায়

লুসেবার্ট কে নিয়ে কিউকেনের ছবির নাম - 'লুসেবার্ট: সময় ও বিদায়'। ছবির এক জায়গায় কিউকেন অভাব বা না-থাকার ভাবনাকে ঘনিয়ে তোলেন। লুসেবার্টের স্টুডিওর মধ্যে ওঁর ছবি ও কবিতার অলিগলির মধ্যে দিয়ে ক্যামেরা এমনভাবে ঘুরতে থাকে যেন শিল্পীর অনস্তিত্বটাই আসল বিষয়। শিল্পী যেন তার শিল্পের জগতের দ্বাররক্ষী। গাইড। যতোই যা বলুক, যতোই তথ্য দিক, কোথায় সে আমাদের যাতায়াত ও কৌতূহলকে রোধ করে। গ্রাহকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। শিল্পীর অভাবই যে তার শিল্পের সবচেয়ে কাছে যেতে পারা। হারিয়ে যাওয়াটাই যে সর্বোচ্চ জয়, কিউকেনের ছবি সেই বোধে দর্শককে বিঁধবেন। এই রকমই আরেকটা হৃদয় মোচড়ানো ছবি 'শেষ কথা ঃ আমার বোন য়োকা (১৯৩৫-১৯৯৭)'।

য়োকাও কিউকেনের মতো কর্কটরোগের শিকার হন। বহু বছর ধরে রোগের সঙ্গে জীবনযুদ্ধ চলে। সেই সময়েই ভাই তার ছবি তুলছে। সাক্ষাতকার নিচ্ছে। ভাইয়ের কাছে য়োকা তার নিজের জীবনের জয়, পরাজয়, আনন্দ খামতির খুঁটি নাটি তুলে ধরছে। রোগশয্যায় শুয়ে সমব্যাথার কামনা না ক'রে, যন্ত্রনায় কোলে না গুমরে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে রোগকে হারিয়ে দিতে পারার সংস্কৃতি আমাদের নয়, পাশ্চাত্যের। য়োকা তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে ওঠেন ভাইয়ের ক্যামেরার সামনে। লুসেবার্টের ছবির মতোই এই 'শেষ কথা' ছবিও শেষ হচ্ছে একটা স্থিরচিত্র দিয়ে।

ঠিক বললাম কি ? নাকি স্থিরচিত্রের গতিচিত্র ? ট্রিটমেন্টের যন্ত্রনার মধ্যে একদিন য়োকা ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। বালিশে মাথা ভারী, বালিশ কোঁচকানো ; নরম কম্বলে টানটান ক'রে মোড়া শরীর ; চোখ বোঁজা - পুরু ঈষদোষ্ণ এক আলোয় ছবিটা ভাসছে। সেই ছবিটাকে এক ঘন রঙের পটভূমিকায় রেখে কিউকেন তার ওপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকেন। কয়েক মিনিট মুভি ক্যামেরা ধ'রে রাখে সেই স্পর্শ, এক স্থিরচিত্রকে জীবিত ক'রে তোলা এক গতিচিত্র আমাদের আবার দেখিয়ে দেয় 'অভাব' -এর গুরুত্ব। যা আপাত অর্থে অনড়, মৃত, স্থির - তারো একটা জীবন থাকে, যে জীবন গড়নে আলোর যেমন ভূমিকা, তেমনি ক্যামেরার লেন্সের, আর তার চেয়েও বড় কাজ করতে হয় দেখার চোখটাকে।